চন্দ্রশেখর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পর্ষদ সংস্করণ একাদশ প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

(প্রথম প্রকাশ বঙ্গ দর্শন, শ্রাবণ ১২৮০-ভাদ্র, ১২৮১, পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৭৫ শেষ সংস্করণ ১৮৮৯)

www.worldmets.com

চন্দ্রশেখর

উপক্রমণিকা

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড

ষষ্ঠ খণ্ড

চন্দ্রশেখর
উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ: বালক বালিকা

ভাগীরথীতীরে, আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে, শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া, পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর তর রব সে ব্যঙ্গ সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎ সুকুমার বন্য কুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল; আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টপুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময়ে সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খান নৌকা যাইতেছে বল দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ, আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তার পর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোণা জ্বলিতেছে।

চন্দ্রশেখর
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—

কোথায় কালপ্রভাবে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেকদিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে, দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল, "আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।" দুই জনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুইজনেই পটু, তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না। বর্ষাকাল—কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয়মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।

সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেকদূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না—চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুইজনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেকদূরে গিয়া প্রতাপ বলিল, "শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে!"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন—এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল। মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

চন্দ্রশেখর
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বর মিলিল
যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্‌সি বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল না। চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সে দিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইল। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদগ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই; দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিক কাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জনের বিঘ্ন বলিয়া অধ্যাপনার বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়, অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহকর্মের বিশৃঙ্খলা ঘটে—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসার—বন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

এই বিবাহের আট বৎসর পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

চন্দ্রশেখর
প্রথম খণ্ড
পাপীয়সী
প্রথম পরিচ্ছেদ : দলনী বেগম
সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে, এক স্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠমধ্যে, সুরঞ্জিত হর্ম্যতলে, সুকোমল গালিচা পাতা। রজতদীপে গন্ধ, তৈলে জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের বালিশে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্বাকৃতা, বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখন বলিতেছে, "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছে, "কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি এক জন দাসীমাত্র, আমার জন্য এত দূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল। আবার অল্প দূর পড়িয়াই বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন, আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই। তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে এক জন বৈ ত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? এক জন কেন আর এক জনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিল। নির্দোষঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণরচিত সুগন্ধ-বিকীর্ণকারী

উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গসঞ্চালন মাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্য মাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন, সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল, এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া গায়িতেছে। এমত সময়ে, নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া, ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীরকাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্বক, এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গায়িতেছিলে?" যুবতীর নাম, বোধ হয়, দৌলতউন্নেসা। নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ "দলনী" বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই "দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও—আমি শুনিব।"

তখন মহাগোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন, নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ নাই। তার পর,—তার পর, দলনীর মুখ ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না—কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরুস্বভাব কবির, কবিতা-কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কন্ঠাগত প্রণয়সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সমুখে পুনর্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাহাদিগের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি সে সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব হইল। মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন?—আমি বালিকা, দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটি অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, “সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে যেমন ভালবাসি, আমি কখন স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই, বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।”

দলনীর শরীর কন্টকিত হইল। দলনী অনেক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, “যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?”

মীরকাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুতরস্বরে কহিলেন, “আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্ত আমারই, এই জন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, ‘রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।’ কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।”
দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল, “প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।”

মীরকা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, “আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।”

“কি?”

“আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন?”

“কেন, তুমি যুদ্ধ করিবে না কি? বল, গর্‌গণ খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমায় বাহাল করি।”

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীরকাসেম তখন সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন যাইতে চাও?”

“আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।” মীরকাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব?”

মীরকাসেম হাসিয়া বলিলেন, “তবে কলমদান দাও।”

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা সুবর্ণনির্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীরকাসেম হিন্দুদিগের জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, “কি দেখিলেন?”

মীরকাসেম বলিলেন, “যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।”

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীরমুন্‌সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধ—পরে, দলনী বেগম কোথায় থাকিবে?"

মীরমুন্‌সী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

চন্দ্রশেখর
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভীমা পুষ্করিণী
ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারি ধারে, ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালো জলে পড়িয়াছে; কালো জলে রৌদ্রের সঙ্গে, তালগাছের কালো ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না, আমরা জল নই। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরে গ্রথিত জলপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণকুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া, জলতরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদুবায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জলস্পৃষ্ট করে, বক্ত্রমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে; সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে; জল পতনকালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই সমান। জল চঞ্চল; এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

পুষ্করিণীর শ্যাম জলে স্বর্ণ রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ।

শৈ। ঘরে যাব না লো সই!

আমার মদনমোহন আসচে ওই।

হায়! যাব না লো সই!

সু। মরণ আর কি? মদনমোহন ত ঘরে বোসে, সেইখানে চল না।

শৈ। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী, ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

সু। নে এখন রঙ্গ রাখ। রাত হলো—আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমির মা বলছিল, এদিকে একটা গোরা এয়েছে।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি?

সু। আ মলো, তুই বলিস কি? ওঠ, নহিলে আমি চলিলাম।

শৈ। আমি উঠবো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্যসত্য তুই কি এই সন্ধ্যেবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না; অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল। অঙ্গুলিনির্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে, এক তালবৃক্ষতলে, সর্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল কলস, গড়াইতে গড়াইতে ঢক ঢক শব্দে উদরস্থ জল উদ্‌গীর্ণ করিতে করিতে, পুনর্বার বাপীজলমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষঃ পর্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া আর্দ্র বসনে কবরী সমেত মস্তকের অর্ধভাগ মাত্র আবৃত করিয়া প্রফুল্লরাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে, অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের নিকটে আসিল।

ইংরেজ, দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুম্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁকজমক, এবং চেন্ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া, জলের নিকটে আসিয়া, বলিল, "I come again fair lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

"Oh—ay—that nasty gibberish—I must speak it I suppose. হম again আয়া হ্যায়।"

শৈ। কেন? যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?"

শৈ। বলি, যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম! John you mean? হম জন নহি, হম লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম, লরেন্স অর্থ বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স ফষ্টর, পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবৃক্ষতল হইতে অশ্বমোচন করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্বতপ্রতিধ্বনি সহিত শ্রুত গীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, "সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফষ্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত। দেশভেদে কি রুচিভেদ জন্মে? তুষারময়ী মেরী কি শিখারূপিণী উষ্ণ দেশের সুন্দরীর তুলনীয়া? বলিতে পারি না।"

ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী ধীরে ধীরে জল কলসপূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল। তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া, নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয়ে জানু বন্ধন করিয়া মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে, তুলটে হাতে-লেখা পুতি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর এক শত দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, তদুপরি চন্দন-রেখা।

শৈবলিনী গৃহপ্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, 'যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্র হইল, তখন কি বলিব?' কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন?"

শৈবলিনী বলিল, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে!"

চ। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।

চ। বটেও ত—এখন এলে না কি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না" এই বলিয়া আমার শাঙ্কর ভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর, প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথামত, স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন, তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্প রাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কন্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া, পুতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিযা, আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়নপথে কৌমুদীপ্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে! তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে, শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদিত পদ্মকোরকসদৃশ, লোচন—পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমলা সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বূলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ—স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাস-চাঞ্চল্য-শূন্য, সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি, ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীরমুন্সীর নিকট হইতে সম্বাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠিয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপরহরণ রোগ জন্মিত। ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্মস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়ন-পথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল, কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠিতে ফিরিয়া গেলেন। ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষের অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল, এবং কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, সংসার-সমুদ্রে স্ত্রীলোক তরণী স্বরূপ—সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য—যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া, বাঙ্গালি সুন্দরীকে এ সংসারে সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালির মেয়ে, ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না? ফষ্টর কুঠির কারকুন্সকে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কারকুন শৈবলিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।

বাঙ্গালির ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু একটি একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে। শৈবলিনীর সেই দশা ঘটিল। শৈবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে, ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, "ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও |"শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল। তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব; কিন্তু সে যাই হউক, ফষ্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" যিনি কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফষ্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

শৈবলিনীর রূপ ফষ্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনীর আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এই সময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তাঁহারা দুইটি মাত্র কার্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভসম্বরণে অক্ষম, এবং পরাভব স্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল। এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্যে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যসম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখন দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভ সম্বরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে ধর্মশব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "Now or never!"

এই ভাবিয়া, যে দিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সেই দিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে—অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েক জন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব। দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, দ্রব্য সামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পালকী দেখিলে, ঐ পালকীর মধ্যে সে গিয়াছে।"

যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষে বসিল। বসিয়া বসিয়া, নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথম পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল। সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী, শৈবলিনীর সখী। আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া এ স্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল। গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নাপিতানী

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকাসমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। হিন্দু দাস দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাস-দাসী কেন?

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। এমত শঙ্কা ছিল না যে, তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের নৌকা শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্তকে যত পার বিশ্বাস করিও, কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না। প্রভাতবায়ু বড় মধুর;—চোরের মত টিপি টিপি আসিয়া, এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকাদাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে—কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ এই ক্রীড়াশীল মধুরপ্রকৃতি প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিতা করিতেছে; আকাশস্থ দুই একখানা অল্প কালো মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে; তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু মৃদু নাচাইতেছে, স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে—নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কাণের কাছে মধুর সংগীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে বায়ু বড় ধীরপ্রকৃতি—বড় গম্ভীরস্বভাব, বড় আড়ম্বরশূন্য—আবার সদানন্দ! সংসারে যদি সকলই এমন হয় ত কি না হয়! দে নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্বাপেক্ষা একটু বড় বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্রমার্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখন কখন ঢেউগুলা স্পর্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে—"দেহি পদপল্লবমুদারং!" নিতান্ত পক্ষে পায়ের একটু অলক্তক-রাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কাণে মিলাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কাণের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গসকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া, মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল—নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছাড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবকে প্রণাম করিয়া, নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপে ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা, প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না। রক্ষকেরা ভদ্রহাটির ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে, এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে সাড়ীপরা—সাড়ীর রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুপড়ী। নাপিতানী নৌকার উপর অনেক কালো কালো দাড়ী দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানি আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফষ্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পলায়, অথবা প্রাণত্যাগ না করে, তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃত পাক, উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল, বলিল, "হাঁ গা—তোমরা কোথা থেকে আসচ গা?"

চাকরাণী রাগ করিল—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন খায়—বলিল, "তোর তা কি রে মাগী! আমরা হিল্লী, দিল্লী, মক্কা থেকে আসচি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বলি তা নয়, আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়েছেলে কেহ কামায় তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আলতা পরিবেন কিনা। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আলতা পরিব।" তখন রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া, দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। এবং তাঁহার একটি চরণ লইয়া আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তোমার বাড়ী কোথা?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপিতানী, তোমার নাম কি?"

তথাপি উত্তর পাইলেন না।

"নাপিতানী, তুমি কাঁদচ?"

নাপিতানী মৃদু স্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ কাঁদচ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী বাস্তবিক কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি আসতে মাত্র চিনেছি। আমরে কাছে ঘোমটা। মরণ আর কি? তা এখানে এলি কোথা হতে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও! আমার এই সাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আলতারর চুপড়ী নাও। ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন করে?"

সু। কোথা হইতে আসিলাম—কেমন করিয়া আসিলাম—সে পরিচয়, দিন পাই ত এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া, হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম।লোকে বলিল,বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।

শৈ। একলা এলি কেমন করে?

সুন্দরীর মুখে আসিল, “তুই কালামুখী সাহবের পাল্কী চড়ে এলি কেমন করে?” কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল, “একলা আসি নাই। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া, আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।”

শৈ। তার পর?

সু। তার পর তুমি আমার এই সাড়ী পর, এই আলতাসর চুপড়ী নাও, ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া চলিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গিতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর তোমার দশা?”

সু। আমার জন্য ভাবিও না। বাঙালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী; আমরা মনে দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই। আজ হবে কিনা, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলেম। গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি?

সু। ইল—লো! কেন নেবেন না? না নেওয়াটা পড়ে রয়েছে আর কি?

শৈ। দেখ—ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পুরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “সত্য কথা বলবি?”

শৈ। বলিব।

সু। এই গঙ্গার উপর?

শৈ। বলিব। তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের সঙ্গে আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্মাত্মা, অধর্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, “আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে?”

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, ঐ উহাকে ইংরেজে লইয়া গিয়াছিল? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে, কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া, কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—

সু। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন ওঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙ্গকতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন। তিনি ধর্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই তুমি বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক, সে কথা দূর হৌক—এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থাক! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকূলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।—নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মেলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব।—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না। মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও! তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল, বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে! দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুঙ্গেরে যাইবার পূর্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়! ঝড়ে হোক, তুফানে হোক, নৌকা ডুবিয়া হোক, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া, সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া, আলতাকর চুপড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন। দেখিয়া রাজকর্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সম্বাদ বুদ্ধিমান লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা গ্রহণ করেন না।—কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল।

চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আপনাপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহবন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য—কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে তপ্পী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন দেখিতে পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়—আরাম হইবে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে? চন্দ্রশেখর দ্রুত চলিলেন। যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়! চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, ভগবান, আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার বঞ্চিত করিবেন! তাহারই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান করিবেন না? হয়ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি, শৈবলিনী নাই?—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন। পল্লীমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখপ্রতি অতি-গম্ভীর ভাবে চাহিয়া দেখিতেছে—চন্দ্রশেখর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—ভীত হইলেন—অন্যমনা হইলেন—কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া, ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই,—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া, সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

কেহ উত্তর দিল না; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—কেহ উত্তর দিল না। ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বুসঞ্চারী মৃদু-পবন-হিল্লোলে, ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গায়িতেছিল।

* * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন, চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্যন্ত এই সকল কার্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া, তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্নসংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

চন্দ্রশেখর
দ্বিতীয় খণ্ড
পাপ
প্রথম পরিচ্ছেদ : কুল্‌সম
"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্‌।"

দলনী বেগম, এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরকজড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল; একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া "বাঁদী" বলিয়া গালি দিল। এ গালী দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে এক জন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্‌।"

কুলসম্‌ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুইখানা কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে একজন ইংরেজ চড়ন্দার; সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে, নৌকা ছাড়িয়া দাও। উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে। গুর্গণ খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক। নৌকা ছাড়িব না।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। বলে, আজিমাবাদের* কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজেরা হঠাৎ বেদখল না হয় বলিয়া সেখা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা গুর্‌গুণ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি হিব্রাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা যাহাই করি না কেন, ইংরেজকেলড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির। তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই? ফলে সে সত্য কথা। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সেরাজউদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে!

দলনী অনেক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল।

পরে কহিল, "কুল্‌ সম, তুই একটা দুঃসাহসের কাজ করিতে পারিস?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর। তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত? এত আতর গোলাব সোণা রূপা চুরি করিলাম, কই কেহ ত টের পেল না! আমার মনে বোধ হয়, পুরুষ মানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়ে মানুষের চাতুরী কখন টের পাইল, এমন ত দেখিলাম না।

দ। দূর! আমি খোজা খানসামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন। তিনি না জানিতে পারেন কি?

কু। আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?

দ। একবার গুর্‌গণ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস?"

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষীরা আহারে মন দিল!

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম বলিল, "কাজ অতি সামান্য। একজন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব। যা হোক, তোমার কর্ম তুমিই জান। আমি দাসী। পত্র দাও—আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

----

*পাটনা

চন্দ্রশেখর
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গুর্‌গণ খাঁ
যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুর্‌গণ খাঁ।

এই সময় বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুর্‌গণ খাঁ এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি জাতিতে আর্‌মাণি; ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান; কথিত আছে যে, তিনি পূর্বে বস্ত্রবিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি নূতন গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন, কামান বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল; তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীরকাসেমের এমত ভরসা ছিল যে, তিনি গুর্‌গণ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুর্‌গণ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীরকাসেম কোন কর্ম করিতেন না; তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীরকাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুর্‌গণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গণ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতাস্থ কয়েকজন আর্‌মাণির পত্র। পত্র পাঠ করিয়া, গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপ্দার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গণ খাঁ কহিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে?"

চোপ্‌োদার কহিল, "আছে।"

গুর্‌। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে। এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ?

চোপ্দাের কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর্‌। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুরগণ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখন কোন্ পথে যাই? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ—যে কত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির। আমিই বাঙ্গালার কর্তা। আমি বাঙ্গালার কর্তা? কে কর্তা? কর্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি মীরকাসেমের গোলাম—আমি কর্তার গোলামের গোলাম! বড় উচ্চপদ! আমি বাঙ্গালার কর্তা না হই কেন? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? ইংরেজ! একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে, আমি কর্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীরকাসেমকে গ্রাহ্য করি না—যেদিন মনে করিব, সেইদিন উহাকে মসনদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি—মই ফেলিয়া দিতে পারি। কন্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাদের তাড়াইব। এখন মীরকাসেম মসনদে থাক; তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেইজন্যই উদ্যোগ

করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?"

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্‌গণ খাঁ তাহাকে পৃথক আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গণ খাঁ বলিলেন, "আজি অনেকদিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম কেন করিলে?"

দলনী বলিল, "দুঃসাহসিক কিসে?"

গুর্‌গণ খাঁ কহিল, "তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে আমাকে—দুইজনকেই বধ করিবেন।"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব। তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমত ভরসা করিতেছ! এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন, বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্যন্ত আমরা কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে এ কথা কি সত্য?

গুর্। এ কথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না?

দ। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত। এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। কেন?

গুর্। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি? না, বালিকার ন্যায় কাজ করিয়া থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে?

গুর্। হউক। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি। হয়, হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন?

গুর্। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে?

গুর্। ইংরেজেরা কয়জন গুর্‌গণ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে?

দ। সেরাজউদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হইতেছে যে, কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদের সর্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না।

গুর্‌। এ সকল কর্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। "আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।" বলিয়া, দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুর্‌গণ খাঁ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীরকাসেম আমার স্বামী?"

গুর্‌গণ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।"

দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া, লোচনযুগল বিস্ফারিত করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,—"তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া ধর্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই; নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমি জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্‌গণ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে; সে মীরকাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে স্নেহ করিতে করিতে পারে, কিন্তু সে মীরকাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহবতী। ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। গুর্‌গণ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গণ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্বারোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছিল, দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে, ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না।"

কল্‌সম বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, “তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হইবে ।”

সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবনহিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল, “কল্‌সম!”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দলনীর কি হইল

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী, রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি করিবেন?”

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, “আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক ।”

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব, ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?

কু। দরবারে।

দ। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরিবার কালে তাঁহাকে বলিতে পারিব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানে শীঘ্র ধরা পড়িব।

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকারে পুরুষ-মূর্তি গঙ্গাতীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকারমধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ, গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয়-বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল। দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি আরও অন্ধকারমধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, “এখানে তোমরা কে?” এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি মৃদুতর স্বরে বলিল, “আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?”

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কন্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কন্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুল্সসম বলিল, “আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?” পুরুষ কহিলেন, “আমরা? তোমরা কয় জন?”

কু। আমরা দুই জন মাত্র।

পু। এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?

তখন দলনী বলিল, “আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?”

শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, “অতি সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকের উপকার হইয়া থাকে, তোমরা যদি বিপদগ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।”

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে?

আগন্তুক কহিলেন, “আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।”

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতে করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ্ শুনিতে চান, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।” এই বলিয়া দলনী ও কুল্সমকে সঙ্গে করিযা নগরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে করাঘাত করিয়া “রামচরণ” বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া, ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, “তুমি গিয়া শয়ন কর।” শুনিয়া রামচরণ একবার দলনী ও কুল্সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী, এত রাত্রে দুইজন যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া আসিলেন কেন? এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। ব্রহ্মচারীকে রামচরণ দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়াই জানিত—সে বিশ্বাসের খর্বতা হইল না। শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, “বোধ হয়, এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, এ কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।”

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, “ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্য ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে। যাহা কর্তব্য, তাহা অবশ্য করিব।”

হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না। ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, “আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে, পত্রের দ্বারা তাঁহাকে বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।”

দ। পত্র লইয়া যাইবে কে?

ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। ব্রহ্মচারী রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, "এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।"

অগত্যা স্ত্রীলোকেরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন।

মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত। সুতরাং সকল কর্মচারীই তাঁহাকে মানিত। মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহার মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্বার, পূর্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কাল যাপন কর।"

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনীকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখন "অভাগী," কখন "পোড়ারমুখী," কখন "চুলোমুখী" ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া স্বামীর কৌতুক বর্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তার পর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তার পর কিছুদিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপদ্বকালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী। তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং অকর্মণ্য। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাঁহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশপূর্বক পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা; তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের

চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমীদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশবিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?"

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে?

প্র। কি হইবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে?

প্র। কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্বকথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর—শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছুদিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। একদিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন?"

সুন্দরী বলিল, "তাঁর মুণ্ডপাত করিব বলে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব বলে—তাঁর মুখে আগুন দিব বলে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী!"

সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেইজন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিসকে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্যের জন্য গভর্ণর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্তের সম্বাদ পূর্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গের আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু গুর্‌্গেণ খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তখন আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অদ্য আমিয়টের সঙ্গে ফষ্টরের এই কথা স্থির হইল যে, যদি নবাব ছাড়িয়া দেন ভালই; নচেৎ কাল প্রাতে ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েকজন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েকজন সিপাহী। এইখানিতে অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্ গণ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর একজন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্ধ—দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলেন। প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুমদারর?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমত সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, ভড়ের সিপাহীরা "কিয়া হৈ রে?" বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারিদিক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিকে অল্প ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোকসকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; নগরমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী-শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্তপ্রবাহিণী গঙ্গা ধাবিতা হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফষ্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরাজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু তন্মুহূর্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল— আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায়, গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়ে, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া বজরার বন্ধনরজ্জু সকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ বলিয়া নাবিকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘুহস্ত, বলবান প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত না। প্রতাপ এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফষ্টরের বাহিরে আসা, তাঁহার পতন, এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটি লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সেই লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" সিপাহী নৌকার ছাদের উপর জানু পাতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ হয়, তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর আর সকলে যেখানে যে আছ, সেইখানেই থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুক হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে, নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে শব্দ তখনই নিবারিত হইল।

তখন ভড় হইতে জনকয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গিতে উঠিয়া, বজরা ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুইজন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং ভড়ের সিপাহীগণ কসাড়বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বজ্রাঘাত
সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরণী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাহার দাসী। শৈবলিনী এখনও বিবি সাজে নাই—পরণে কালাপেড়ে সাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শ প্রার্থিশাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে, "আমার কাছে আইস আমি হাঁস ধরিয়া দিব।" প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ —ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। পার্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমাদেরই পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি? সাহেবেরই পাপের ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয় আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি?

এই বলিয়া শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া, একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল। পার্বতী বলিল, "এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।"

শৈবলিনী বলিল, "অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা পড়া করি।"

পার্বতী রাগ করিয়া বলিল, “ডাকিতে হইবে না; তাহারা আপনারাই আসিবে।”

কিন্তু চারি দণ্ডকাল পর্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, “আমাদের কি কপাল! ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।” পার্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া, এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল। পরে, তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে, পার্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবিলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, “আপনি আসুন।”

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে,—কোথায় যাইব?”

রামচরণ বলিল, “আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।”

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিলেন। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিলেন। পার্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে নিষেধ করিল। পার্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল, রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্সম সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না। উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাহার বাড়ী?” রামচরণ সে কথা কাণে তুলিল না।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইও। রামচরণ পথে ভাবিল—“এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কি না? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।” এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এদিকে প্রতাপ, পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতের বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, “এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।”

রামচরণ আসিয়া দেখিল,—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না, তাহা আমরা জানি না,—আমরা যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি লিখিতেছি। রামচরণ শৈবলিনীকে জাগরিতা না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “তিনি ঘুমাইতেছেন—ঘুম ভাঙ্গাইব কি?” শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইল—মনে মনে বলিল, চাণক্য

পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন; নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোল গুণ। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমোও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।"

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছে।

প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার শ্বেত-বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত-পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থির শোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া, বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না এমত নহে—কেবল অন্যমনবশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেকদিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যান নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তাবশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রতাপ জল আনিয়া, মূর্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশির-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছসকল আর্দ্র করিয়া, কেশগুচ্ছসকল ঋজু করিয়া, ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্বী, শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কন্ঠ কাণে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনাবাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই। হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি, আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীতভাবে, প্রায় বাষ্পগদ্গদ হইয়া বলিলেন, "যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল,—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য আমি গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ বলিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ! ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ! তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম, ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম, ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

শুনিয়া, প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া, সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গল্‌ষ্টন ও জন্‌সন

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে, এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতিদূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজসেনাভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস, গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া, প্রতাপের বাসা পর্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল,—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারিজন সিপাহী এবং একজন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন যে, দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া এখনই আমার নিকটে লইয়া আইস। বকাউল্লা কহিল, "তবে দুইজন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ সয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গল্ষ্ট ন ও জন্সগন নামক দুইজন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন। গমনকালে গল্ষ্টন বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গল্ষ্টলন জন্সকনকে বলিলেন, "তবে বাতি ও দেশলাইও লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ

হইবে।"

জন্স ন পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন, ইংরেজদিগের রণ—যাত্রার গভীর পদবিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাতে পশ্চাতে চারিজন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগরপ্রহরীগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্ ষ্টন ও জন্ওসন সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল। রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিতহস্ত। বস্ত্রকুঞ্চনে, অঙ্গরাগকরণে বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই—তাহার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ—অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে রামচরণ তেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, “এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশাই? বোধ হয়; কিন্তু যা হোক একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।”

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুইজনে অস্ফুটস্বরে বিকৃত ভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে “ইণ্ডিল মিণ্ডিল” বলিত—এখনকার লোকে বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, “রসো বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা।”

রামচরণ আরও ভাবিল, “বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্তাকেও ডাকি ।” এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য ফুরাইল। জন্সয়ন বলিল, “অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।”

গল্ষ্টন লাথি মারিল। দ্বার, খড় খড়, ছড় ছড়, ঝন ঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কাণে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেবার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্সপন লাথি মারিল। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

“এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক ।” বলিয়া ইংরেজেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, “অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আমবাতের কুঠি থেকে।” রামচরণ আমিয়টের পরিবর্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আটজন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে! তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্স ন জ্বালিত বর্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্সসন বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, এই?”

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল, হাঁ, ইহারাই বটে।”

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজেরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্সবন তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ, চরণে আহত হইয়া, চলিবার শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক, এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?" গলটষ্েনন প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপরে বন্দুক হাতে প্রতাপ গর্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জুনাব, এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্সটন, প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্ ষ্টন আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্ষ্টসন পতিত রামচরণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা?" জন্সান দুইজন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকে লইয়া আইস।" দুইজন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্সউম জাগ্রত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মাত্র করিয়া এই সকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজেরা, প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক, অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে, দলনীর নীলমণিপ্রভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি!" গল্ষ্টরন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্সলন ও গল্ষ্টদন ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্সথমকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাদের সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্সম মহা ভীতা এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পাপের বিচিত্র গতি

যেমন যবনকন্যারা অল্প দ্বার খুলিয়া, আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিনজনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতিসুলভ কুতূহলে তিনজনেই পীড়িতা; তিনজনেই ভয়ে কাতরা; ভয়ের স্বধর্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আর ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ—সহজই বা কিসে? এতদিন জলে বাস করিলাম, কই এক দিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া, জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমিও ত কোন উদ্যোগ করি না। মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষে মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ

মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না। প্রতাপের কি হয়? যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী—পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার—প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?”

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীরপার্শ্বে, শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া, নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, মনে পড়িল। তুলসী-মঞ্চ—তাহার চারিপার্শ্বে পরিষ্কৃত, সুমার্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল! কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ, শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন। কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবল কুসুম, পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধি বায়ু, ভীমাতটে সেবন করিতেন; জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফাটিক বিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব; মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠির বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষ-জাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব। সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব—গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে, জানিতাম না যে, ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।” পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল, “পরকাল? সে ত যে দিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেই দিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেই দিনেই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের জল বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এত কাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই, বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল, তাহাতেই অগ্নি লাগে। বোধ হয়, আমারই জন্য প্রতাপ এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছে,—আমি কেন মরিলাম না?”

চন্দ্রশেখর

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; অধর দংশন করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ, রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল। সে আবার বলিল, “মরিলাম না কেন?” শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটি “গেঁজে” বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিষ্কোষিত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, “বৃথা কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম? কেন এতদিন এ ছুরি আমার এ পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন,—কেবল আশায় মজিয়া। এখন?” এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেইভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, “আর একদিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম। সেদিন তাহাকে মারি নাই, সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল,—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব? না—আজ নহে। মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠ নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি ত তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুতিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ

করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল! দেখিল, চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় খণ্ড
পুণ্যের স্পর্শ
প্রথম পরিচ্ছেদ : রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে, একজন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীত ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন, বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখতুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, সার্বভৌম মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানবপীড়িত, অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে, মনোমোহিনী বাকশক্তির দৈবাবতারণা করিয়া, অনন্ত, অপরিজ্ঞেয়, বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন যে, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অননত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়মায় নহেন। যদি বল, তিনি নির্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, তিনি নির্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই, উপায় নাই, তবে যদি সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ—নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণনা করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বমী শতমুখে পরোপকার ধর্মের গুণকীর্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিয়া অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দসাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর, বাক্যপরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সারবতী. রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। সর্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিত করিলেন। তাঁহার সুকন্ঠনির্গত,

উচ্চারণকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্যসকল কখন মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখন বীণানিক্বণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল! ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কন্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

চন্দ্রশেখর
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নূতন পরিচয়
এদিকে যথাসময়ে, ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুল্‌সমকে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিল, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা, সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল, সৎকার্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য করেন, তাঁহাদের কার্যকে সৎকার্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী, আপত্তি না করিয়া, শিবিকারোহণ করিল।

খোজা, শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহই নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টনন ও জন্‌সন দলনী ও কুল্‌সমকে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাহারা কে, তাহা তিনি জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল, এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, বেগমকেই ইংরেজেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈ। আজ্ঞা হাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন, জান?

শৈ। দুইজন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নূতন সখ

নবাব গুর্গকণ খাঁকে, অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্তব্য; কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল?"

গুরগারণ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে।–আর—"

ন। আমিয়ট কাল রাত্রে এই সহর মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

ন। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্। তাহারা এ সহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

ন। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক এক জনকে রাখিয়া গিয়াছে।

ন। এরূপ হঠাৎ, বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়ন্দার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেই জন্য রাগ করিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

ন। কে খুন করিয়াছে শুনিয়াছ?

গুর্। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

ন। আচ্ছা করিয়াছ। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে কি আজিমাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

ন। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সম্বাদ দাও নাই কেন?

গুর্। আমি এই মাত্র শুনিলাম।

এ কথাটি মিথ্যা। গুর্গদণ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্গ ণ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব, গুর্গনণ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্গাণ খাঁ যখন যান, তাঁহার প্রতি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই, "যত দিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীরমুন্‌সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে, এবং তাহার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া, হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট না যুদ্ধ করিয়া কলেকৌশল ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দিও। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক—অগ্রে পঁহুছিবে।

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজেরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম যে, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি?"

ন। ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদ পৌঁছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া, কি জানি যদি ইংরাজেরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে। মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্মচারীসকল আছে, তাহারা কলেকৌশলে ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাঁহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাঁহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া, তাঁহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত যোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না—তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না। যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রু কুঞ্চিত করিল, বলিল, "প্রভু! না পারি আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, "মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই—নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্যসিদ্ধি করিবে।" শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক, একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে একজন দাসী, একজন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব, চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দীন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল, নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও। এবং একজন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া, এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

ন। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া, দেখিয়া, সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিল। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও। কখন যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীরকাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈ কি? হয়ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।"

মসীবুদ্দীন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল। এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দীন সাহস করিযা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, এ সকল কি হইবে। মনে মনে কহিল যে, এ দোসরা চাঁদ সুলতানা।

সেই রাত্রেই তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে, সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজী ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত; যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে

আকাশ অনন্ত; তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীর শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয়, গঠিত মূর্তির ন্যায়, বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে, স্নিগ্ধ স্ফাটিক-দীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ আসন, শয্যা, চিত্র পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। একজন সুরাপান করিতেছেন, ও পড়িতেছেন। একজন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরব বিদীর্ণ করিয়া, সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জনকসনকে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্সটন বলিলেন, "কার কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে; কিন্তু সেই জলভূমি নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমের মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তরমধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?" স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আমিয়ট পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

চন্দ্রশেখর
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হাসে
বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্ট নকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না। তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টশন প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজ মহলে হিন্দিতে তাঁহার বড় পশার। গল্‌ষ্টেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। কেন কাঁদিতেছ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। তোমার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

শৈবলিনী তদ্রূপ।

গল্‌ষ্টীন হার মানিল। কোন কথার উত্তর দিল না দেখিয়া ইংরেজেরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙ্গালির মেয়ে। একজন বাঙ্গালিকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালি মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবেরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েচে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবর্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। হৃষ্টচিত্তে, কেন না শৈবলিনী পরম সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানসামা বলিল, "খাও না।" শৈবলিনী বলিল, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁওয়া খাব কেন?

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "একজন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা, যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী, প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্সীনতে, একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে পিছে সান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ওগো ঠাকুর!"

প্রতাপ বলিল, "কেন?"

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?

প্র। কেন?

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে। দুটি দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না।

বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা সান্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। সান্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল বেড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা; কখন ইচ্ছাপূর্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র। আমিয়ট দেখিয়াছিলেন যে, এই "জেন্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। সান্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায় পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। সান্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল—নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে, দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল,—মুখমণ্ডল স্থিরপ্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতিলঘুস্বরে, কাণে কাণে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কাণে কাণে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও, নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল। আমি পাগল—জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাত খাইব

না।" তখনি আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল? কি হইল?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইল। সান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্‌সী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদী ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতের সান্ত্রী ডাকিল। এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব? তুই বাপু হিন্দু—বঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস।"

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে, যে নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিতা হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, তাহার ছাদে জ্যোৎস্নার আলোকে, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্ধশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! হামারা বিবি!" ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্বল, শয্যাগত উত্থানশক্তিরহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচ জন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহাব ইনাম দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিয়াছি—ইচ্ছা আছে আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, "আমি ধরিতেছি—তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অগাধ জলে সাঁতার

দুই জনে সাঁতারিয়া, অনেকদূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই ঊর্ধ্বস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল!

তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল-সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে,—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর না, না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না—তারা তেমনি জ্বলে—তীরে বৃক্ষ তেমনি দোলে, জলে চাঁদের আলো তেমনি খেলে। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কত কাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর এক দিন এমনি সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন, প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ? যা বল তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশ বর্ণ ধারণ করিল। নীল জল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারি হস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ, প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলতরঙ্গরবমধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারিপাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণামধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুইজনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কত কাল পরে প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল, "তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর, আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না। বলিল, "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?"

প্র। আমি!

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য আছে—বল আছে—কীর্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস তবে দুইজনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন—নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল। শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল, "প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল। কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "চল তীরে উঠি।"

উভয়ে তীরে উঠিল।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকটে ছিল উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবিশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্তী হইল। কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমার আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে ফষ্টরের আঘাত ও সান্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মুনিব বড় বদ্‌জা ত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আ। কি তামাসা?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী খোশামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোশামোদ করিয়া "মা" "বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোশামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিছু দিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে, রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পর্বতোপরে

আজি রাত্রে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে। সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষ রাত্রে ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিয়াছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার

শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে? ভিক্টর হ্যুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসস্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফাটিকনিন্দিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃপ্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে; ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে; তখন রাক্ষস, শোণিতশোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিতশোষণ করিয়া থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল, ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে পাছে অনুসন্ধানপ্রবৃত্ত কেহ তাহাকে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না॥ বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতাগুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কন্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগে, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কন্টকময়, হিংস্রজন্তুকপরিবৃত পার্বত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এতকাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতা গুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিল।

এমত সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া, গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কন্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্বতারোহণ—চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কন্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তার পর দিগন্তব্যাপী গর্জন। সে গর্জন, বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনী বসিয়া—মাথার উপরে শীতল

জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর ঊরুদেশ পর্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করি নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবন-মোহন হাসি হাসিয়া, ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্বময়ী, সর্বকর্ত্রী, সর্বনাশিনী এবং সর্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না—কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্যোদয়ও দেখিতে পাইবে না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমত সময়ে সেই মনুষ্যশূন্য পর্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে; কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমীদার, এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমীদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয়, কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না; কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশমর্যাদার বিশেষ গর্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্মান বা স্কন্দেনেবিয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভাব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তরগোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমীদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রি প্রভাতে প্রতাপ, নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি। আমি ধর্ম ভিন্ন অধর্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য; কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তার পর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্তব্য এ কার্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে। তার পর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তার পর ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য না হউক, লুঠপাঠ হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রশদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানে রশদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যাইতেছে, সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই এক খানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব।

অতএব আমি ইহা করিব। প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোশামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশে আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল, কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুর সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসম্বাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইল, কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তা আর কোন্ মুখে না বলিব?"

প্রতাপ, রূপসী ও সুন্দরীর সাক্ষাতের পর, পুনর্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুর্গ ণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্বতগুহা—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপর পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাঁহার পক্ষে অবহনীয়, অসহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকি যাহা—সুখ, ধর্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল— আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে পালিত করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পূর্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্বতারোহণশ্রান্তি; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য; তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্ধনিদ্রাভিভূত, অর্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দু-কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃত জীব সকল—চর্ম মাংসাদি-বর্জিত-কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই—অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ ঊর্ধ্ব করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস—গঙ্গায় প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন ইতস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহনির্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে

লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধিরস্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশ মাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিগর্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন, সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল—কখন বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়! রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবেশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্যসত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈ। তুমি কে?

উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর।

শৈ। কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীনবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর— ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর?

উত্তর— জটাধারণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পর্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়?"

উত্তর—কেন?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়েই কি তৎপূর্বে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধানিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না—বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরল চিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইত। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাত দিন সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতেই নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শন কামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্ত ললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্বাংশদর্শী সন্দেহ নাই। নির্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্যচিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায়, অবসন্ন শরীরে, অবসন্ন মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজবিশিষ্ট, সুন্দরগঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট-প্রশস্ত, চন্দনচর্চিত, চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয় সর্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর, সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্বত, অর্ধেক সৌন্দর্য অর্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে

আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা— তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে, বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দম, মৃণালে, কন্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়—সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ ব্রজে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফলমূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফলমূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবসে প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণগুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে। আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্বতমধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডলমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ভিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে। কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখের জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেবদেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—"দেখ, ভগিনি, দেখ, মনুষ্য—কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!" কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধ উঠিতেছে, তার পর আরও ঊর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল,

সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জিতেছে। পিশাচোরা বলিল, "ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও। এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবনসহায় আরাধনার দেবতা, সর্বে সর্বমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র, সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক পূরিল। সেই দুরন্ত নরক—সব সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাঁহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল, তাঁহার মস্তকোপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিলেন, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারী-বেশে চন্দ্রশেখর!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল; মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃপতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "অল্প দিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

চ। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ডাকাইতির পূর্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন; ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন, "শৈবলিনী, দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্যন্ত।"

শৈবলিনী হাতযোড় করিল;—বলিল, "আর একবার বস! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বস—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?" শৈবলিনী স্থিরদৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়াছিল, তাঁহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চ। আছে। কেন মরিতে চাও?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চ। প্রায়শ্চিত্ত করিলে নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈ। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চ। সে কি?

শৈ। এ পর্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন বলিতে পারি না—আমি রাত্রি দিন নরক—স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কন্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, পূর্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভয় পাইতেছ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ।

চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

শৈবলিনী মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈ। সেই নরক!

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে। শৈবলিনী ক্ষণ পরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যেরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে উৎকীর্ণা—অঙ্গুলি তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জন, সেই উত্তাপ, সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার! দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কন্টকের রজ্জুহস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেত্রে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষপরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার্! মার্! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই! মার্! মার্! যত পারিস মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার্! মার্!" শৈবলিনী যুক্তকরে, উন্নত আননে, সজলনয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে, সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে, "মার্! মার্! অসতীকে মার্! আমি সতী, ও অসতী! মার! মার!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিস্ফারিত করিয়া বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন, "শৈবলিনি! আমার সঙ্গে আইস!"

প্রথমে শৈবলিনী শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার সঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, "অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন—মুখে জলসেক করাতে, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, "তুমি কে?" চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,

"স্বামী আমার সোণার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে;

তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে?

তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাতেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে? রসো রসো! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটি কে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হাঁ গা সাহেব! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?"

চন্দ্রশেকর গদ্গদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে? এ কি করিলে?"

শৈবলিনী গীত গাইল,

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,

ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে,"

বলিতে লাগিল, "মনচোর কে? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমিই চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কন্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কন্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল।"

শৈবলিনী বলিল, "আমাকে মারিবে না!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল—কখন কাঁদিতে লাগিল—কখন গায়িতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড
প্রচ্ছাদন
প্রথম পরিচ্ছেদ : আমিয়টের পরিণাম
মুরশিদাবাদ আসিয়া, ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীরকাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সম্বাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্তব্য কি না। গল্স্টন ও জন্সলন এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অসদ্ভাব যতদূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি? আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্সভম বন্দিস্বরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্সমম কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুল্সেম—শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। কেন?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস না; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে?

দ। নহে কেন? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব, সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম; ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস?"

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে; নহিলে ভয় কি?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না?"

কুল্সাম রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?"

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, "তাও কি সাধ না কি?"

কুল্স ম গম্ভীরভাবে বলিল, "কপালের লিখন কি বলিতে পারি?"

দলনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল। কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। দলনী আপন কর্ণের নিকট কিলটি উত্থিত করিয়া—কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা পাইতেছিল, তাহার নিকট কমল—কোরক তুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "তোকে আমিয়ট দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল্ ত?"

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য। সাহেবদিগের ইচ্ছা, যতদিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, "জগদীশ্বর করুন, তুমি শীঘ্র মর।"

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মন হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিল, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।"

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্স ন বলিলেন, "এখানে আমরা তত বলবান নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না?"

আমিয়ট বলিলেন, "যেদিন একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্ট পীড়িত। শত্রুহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও। এবং দুইজন সিপাহী সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

সিপাহীগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়টের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্সযম ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুইজন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণবশতঃ তাঁহার নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলিবর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতর গুলি প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে বড় হুলস্থূল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুক্কায়িত; ইংরেজ এবং তাহাদিগের সিপাহীগণ নৌকামধ্যে লুক্কায়িত। এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

স্থির চিত্তে, নৌকামধ্য হইতে দ্রুতাবতরণপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গল্‌ষ্টন ও জন্সতন, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতি বারে এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবনশ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট বলিলেন, “আর আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি ।”

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিনজন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিভিন্নের ন্যায় নৌকারূঢ় যবনশ্রেণী ছিন্নভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, কল কল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, “গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি ।”

তখন তরবারি হস্তে তিনজন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, “কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন ।”

আমিয়ট বলিলেন, “মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে ।”

“তবে মর ।” এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্ট ন সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবনে গল্‌ষ্টঠনকে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্ট ন্ ও জন্সন্ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

তৎপূর্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আবার সেই

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠাইয়াছিল; সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফষ্টরের দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সম্বাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট সেই নৌকার উপর আসিলেন। দেখিলেন, ফষ্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিষ্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফষ্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান—হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন-বলহীন-তেজোহীন,—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য, বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এ স্থলে ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রান্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল যে, নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল, পলাইতে পারিব না—আমার সে বল নাই। আবার ভাবিল, জলে ডুবি—আবার ভাবিল, জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই। আবার ভাবিল যে, এই দুইটা স্ত্রীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হাল্কা করি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে, দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিল, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা,—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না, কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহার হইলে এ কথায় সন্দেহ করিত। কিন্তু যে যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়, আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়। দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ফ। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না। দলনী তখন ব্যাকুলতাবশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয়, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে নিজামতের নহে, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে নিজামতের নহে, সে কথা তাহার মনে আসিল না। ব্যাকুলতাবশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল, বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্স ম বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানাশুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কু। তুমি বাঁচিলে ত?

কুল্সিম কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।

ফষ্টর কুল্সেমকে বলিল, "কি জানি, যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু পিছু আইসে। তুমিও নাম।"

কুল্স ম বলিল, "যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকাওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।"

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্সামের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্যাস্তের অল্প মাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা, এই সন্দেহে দলনী অঞ্চল ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর চমক হইল—এ নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম! অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈ:স্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূরে দৌড়িয়া নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নববারি—প্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভমধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারিদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোন দিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী; মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোন দিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদী-প্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহাভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তরমধ্যে, এক দীর্ঘাকৃত পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকার পুরুষ, বিনা বাক্যে দলনীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃত পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্বতারোহণ করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নৃত্যগীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ্র জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ্র জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্মরবিন্যাসশীতল মণ্ডপমধ্যে, নর্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে—আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি-খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে,—আর নর্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতেছিল! যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কল কণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন, তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মনকাটা মল-ভালু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে, সূর্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,— আর যখন তোমার কর্ণাভরণ দোলাইয়া, তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্রকিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু-প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোত জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্কিংশ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিকপাত্রে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময়, ফলাহারের পাতে, রজত মুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল, গুর্গিণ খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্বেই পাটনার এলিস সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া, পাটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া, পাটনা পুনর্বার মীরকাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরেজেরা মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্গমণ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র—জগৎশেঠেরা বা গুর্গণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যাহা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়?

গুর্ গণ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে, তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষ—সিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্গাণ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এদিকে, কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না, তিনি তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীরকাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করে নাই; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্গণ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীরকাসেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্গেণ খাঁ দেখাসাক্ষাৎ করিলে, নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুর্গাণ এবং অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুর্গ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্গনণ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুর্গ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব—আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?"

মাহ। কি মতলব?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্গআণ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

সেই সময়ে মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেয়াল গাইল—"শিখে হো ছল ভালা" ইত্যাদি। শুনিয়া মাহতাব হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে? যাক—আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে একদিকে, বাইজি কেদার, হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি রাগ ঝাড়িতে লাগিল, আর একদিকে, গুর্গেণ খাঁ ও জগৎশেঠ রুপেয়া, নোক্সামন, দর্শনী প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্তা স্থির হইলে গুর্গ,ণ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন?"

মাহ। না—দেশী না বিলাতী?

গুর্। দেশী।

মাহ। কোথায়?

গুর্। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে।

মাহ। ধনী কেমন?

গুর্। এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মাহ। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন?

গুর্। মুঙ্গেরের বড় কুঠির সঙ্গে।

মাহ। হিন্দু না মুসলমান?

গুর্। হিন্দু।

মাহ। নাম কি?

গুর্। প্রতাপ রায়।

মাহ। বাড়ী কোথায়?

গুর্। মুরশিদাবাদের নিকট।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মাহ। কেন সে হঠাৎ এ প্রকার করিতেছে?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ?

গুর্। কেন সে এ কার্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ? জমীজমা তালুক মুলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে?

মাহ। আর কি থাকিতে পারে? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল?

বাইজি সে সময়ে গায়িতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে।"

মাহতাবচন্দ্র বলিলেন, "তাই কি? কার গোরা মুখ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দলনী কি করিল
মহাকায় পুরুষ নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল।

দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল। মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে, বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া, কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোকপরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্বার মসনদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীরকাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীরকাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি এই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মানপূর্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খানসামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্টধর্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আত্মহত্যা করিব।" এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য করিবেন। তকি এই মর্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে, দূরবর্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে; কিন্তু যে মুহূর্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত, দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সেই মুহূর্তে তাঁহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ, প্রথম কথা কহিল। তাঁহার কন্ঠস্বরে হউক, অমঙ্গলসূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্তে দলনীর শরীর কন্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্তী পুরুষ বলিল, "তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, "জানি, তুমি এই বিজন স্থানে দুরাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল। আগন্তুক কহিল, "এক্ষণে তুমি কোথা যাইবে?"

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভয় বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী কাঁদিল। প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন পুনরুক্ত করিলেন। দলনী বলিল, “যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেকদূর। কে আমাকে সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইবে?”

আগন্তুক বলিলেন, “তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।”

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, “কেন?”

“অমঙ্গল হইবে।”

দলনী শিহরিল, বলিল, “ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।”

“তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।”

“আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।”

“তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।”

দলনী চিন্তিত হইল। বলিল, “ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে মুরশিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।”

আগন্তুক বলিলেন, “তাহা জানি। আইস।”

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল। দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড
সিদ্ধি
প্রথম পরিচ্ছেদ : পূর্বকথা
পূর্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।

যেদিন আমিয়ট, ফষ্টরের সহিত, মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দ স্বামী জানিলেন যে, ফষ্টর ও দলনীবেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে গিয়া চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে এ সম্বাদ অবগত করাইলেন, বলিলেন, “এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্য কর। এই যবনকন্যা ধর্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহাদের অনুসরণ কর।” চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সম্বাদ দিতে চাহিলেন, রমানন্দ স্বামী নিষেধ করিলেন, বলিলেন, “আমি সেখানে সম্বাদ দেওয়াইব।” চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে. অগত্যা, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী

পাঠাইবার উদ্যোগে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে, শৈবলিনী পৃথক নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দ স্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, ফষ্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দ স্বামী, মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দ স্বামী, চিরকাল পদব্রজে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তিনি তটপন্থে, পদব্রজে, শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন; বিশেষ তিনি আহার নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দ স্বামীকে দেখিয়া, তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "একবার, নবদ্বীপে, অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব, অভিলাষ করিয়াছি; চল তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীর উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও, নিভৃতে রহিল; তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চদ্বর্তী হইলেন। তাহারা নৌকা লাগাইল, দেখিয়া তাঁহারাও কিছু দূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দ স্বামী অনন্তবুদ্ধিশালী,—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

চ। না।

র। তবে, অদ্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না। উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া গেল। ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয়, তথাপি ফিরিল না। তখন রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, উহার অনুসরণ করি।"

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত?"

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকটে গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে। আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।"

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী অন্য মনে ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্তব্য সাধিত হইলে তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দ স্বামী তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই এক দিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে সর্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরকাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীরকাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্গেণ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীরকাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব! আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন।"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিলেন, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে! তুমি জাল পরওয়ানা লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে চিন্তা-গুণ দিল-মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?" মহম্মদ তকি আনুপূর্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যথার্থ বটে। জাল নহে। "কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন না কি?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না?

মহম্মদ তকি মর্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবে মাত্র যৌবন—বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ—মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ-নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল,—"হৃদয়-মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটিতে লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহান্‌শা হা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষ পান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

করিমন নামে একজন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে, তুমি লইও।"

করিমন দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে, স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল,—"করিমন বাঁদি আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল, "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে ঊর্ধ্বমুখে, ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্তারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সম্রাট ও বরাট
মীরকাসেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হঠিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীরকাসেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমির হোসেন একদা জানাইল যে, একজন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীরকাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "একজন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। ওয়ারন হষ্টিং সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিক বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরাধ হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয়া নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস লিখিয়াছিলেন, "এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এজন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম। ভালমন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া, স্ত্রীলোককে সম্মুখে আনিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্সম।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস বাঁদী—মরিবি—?"

কুল্সরম্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন কুল্স মের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীরকাসেম বলিলেন, "যেখানে সে পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্সসম্ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোকে রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি?"

ন। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্মের সহায়—তুই কুক্কুরের

দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুল্সতম আছড়াইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল—এবং যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারিদিক হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—একজন কুল্সড়মের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্স্ম বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।"

"শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীরকাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্গরণ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া কেহ আর কুল্‌স মের উপর আক্রমণ করিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সচম বলিতে লাগিল, “গুর্গাণ খাঁ ও দৌলতউন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীরকাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।”

কুল্‌সাম তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুইজনে গুর্গউণ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্গ ণ খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্তন, আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনীভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাঁহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, “আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক। মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকে সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম, হেষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।”

এই বলিয়া কুল্‌সযম কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি-প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব,—অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল। তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কন্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সসম্ সত্যই বলিয়াছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব”—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন, “শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব-

আলি হিব্রাহিম খাঁ?”

হিব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, “তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।”

হিব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। নবাব তখন বলিলেন, “আর কেহ আমার উপকার করিবে?”

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, “কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?”

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায়

চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনী কে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্ফা ন যুক্তকরে নিবেদন করিল, "অবশ্য এতদিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া মহম্মদ ইর্ফােন বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার?"

মহম্মদ ইর্ফা ন বলিল, "হুকুম করিলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।"

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুর্গাণ খাঁ কত দূর?"

অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।" নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ! ফৌজ! কাহার ফৌজ!"

একজন কে চুপি চুপি বলিলেন, "তাঁরি!"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জন ষ্ট্যালকার্ট

পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্সিমের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্সাম আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন হেষ্টিংস পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্মঠ লোক কর্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাঁহার উপর রাজ্যরক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার কর্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন হেষ্টিংস দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্ণর হন নাই। কুল্সপমকে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফষ্টরও নিজকার্যের অনেক ফলভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্বপ্রভুদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস সম্বর নামে এক জন সুইস বা জর্মান মীরকাসেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিক-কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয়নালায় যবন—শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুল্সোমকে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, একজন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যালকার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল, "নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যালকার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই এক বার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপি লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমীর হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপি মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত—চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যালকার্ট কি আঘাত—চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপি মাথায় দিল!

আমীর হোসেন বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্স মকচ ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্সআম তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্সআমকে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্সনম বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার একজন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্সলমকে ডাকিলেন। কুল্স ম আসিল। ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুলস মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্সহম্ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আবার বেদগ্রামে
বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাটসকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে। কোথাও পচিয়াছে; কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐখানে দাঁড়াইয়া পুস্তকরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী।"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্বস্বপ্নদৃষ্ট করবীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না— বিস্ফারিত-লোচনে চারিদিক দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্রাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ, বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরেজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিনতে পারিস?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্বতী।"

সুন্দরী বলিল, "মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলিব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্লুম। পার্বতী দিদি একটি গীত গা না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশ বাঁকারি পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কবাটসকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে। কোথাও পচিয়াছে; কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐখানে দাঁড়াইয়া পুস্তকরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনী।"

শৈবলিনী কথা কহিল না; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্বস্বপ্নদৃষ্ট করবীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না— বিস্ফারিত-লোচনে চারিদিক দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলির দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ, বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।"

কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না, ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরেজি ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা! চিনতে পারিস?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্বতী।"

সুন্দরী বলিল, "মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলিব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়া নাড়া কল্লুম। পার্বতী দিদি একটি গীত গা না?

আমার মরম কথা তাই লো তাই।

আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?

আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?

মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাই নে পার্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আসবে, সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি

না।"

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর একদিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতি বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন; পরে সেই ভগ্ন গৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যক সামগ্রীসকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া, একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহারে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদ সহকারে সুন্দরী শুনিলেন, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে, চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভ লগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোগবল না Psychic Force?

ঔষধ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তিসকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে

কঠোর অনশন-ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পারমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিত কালে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য, শয্যা রচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র

আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। চন্দ্রশেখর স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডূষ গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।" চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু, প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

শৈবলিনী, নিদ্রাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে?"

শৈবলিনী পূর্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান? শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে কে আছে?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ সকল কথা এত দিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্যসত্য, না কাপট্য আছে?

শৈ। সত্যসত্য, কাপট্য নাই।

চ। তবে এখন?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে?

শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনাসকল পুনর্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রতাপ কি তোমার জার?”

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সেদিনে, গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?”

শৈ। পড়ে।

চ। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্বিক বলিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাসমাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহাপাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূকুঞ্চিত করিল, বলিল, "সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন আমি জাতিভ্রষ্টা কি না। আমি তাহার অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

চ। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর আর পার্বতী।

চ। পার্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রাগের কি প্রতিকার হইবে—বুঝিতে পার?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণকৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে, কোথা যাইতে ইচ্ছা কর?

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চ। কেন, আমার গৃহ?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন?

চ। যদি করি?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই—রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল ও কিসের শব্দ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইর্ফা ন—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্বে?

শৈ। না। দুইজনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইর্ফা ন আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আগামী কল্য আমাদের দুইজনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছিলেন—শেষ রাজা, কেন না, মীরকাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া, মুক্তাপ্রবালরজতকাঞ্চনশোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ মুক্তাহীরামণ্ডিত হইয়া শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্যপ্রভ হীরকখণ্ড রঞ্জিত করিয়া, দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইর্ফা ন বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।" নবাব, প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিলেন, "এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি—এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।"

"আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

ন। তুমি কোন্ জাতি?

ফ। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু—তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সেজন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি। কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, "জানিলাম তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে?"

ফ। ইংরেজ কখন মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিয়াছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্ফা ন চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, “ইঁহাকে চেন?”

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সইম কোথায়?

কুল্‌সবমও আসিল।

নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, “এই বাঁদীকে চেন?”

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্ফা ন, তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন্ পক্ষে যাই; এই জন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি হিব্রাহিম খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, “কুল্‌সপম! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলেন?”

কুল্‌সতম, আনুপূর্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্তসকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “জাঁহাপনা! আমি এই আম দরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।”

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?”

কুল্‌সদম, বিস্ফারিতলোচনে গর্জন করিয়া বলিল, “আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর।”

ন। কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল, দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “ধর্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহারা একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।”

কুল্সসম তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখর নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল, "আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণ ভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি। ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন।—আমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধৈর্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিম্বদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পর তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্ধভক্ষিত অপরাধী অর্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে— কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্ধ্বনয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি কখন তোমাকে ডাকি নাই, কখন তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল

পাপই করিয়াছি! তুমি যে আছ, তাহা কখন মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি— হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর।"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাম্বুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ, দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষু প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুক্কুরের দন্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলেই শুনিল, "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।"

সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি চন্দ্রশেখর, কি কে করিল, ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল যে, "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুজনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই। কখন তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?"

ফষ্টর কুন্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই। সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত?

ফ। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না।

প্রশ্ন। জল?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমত সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুরুম্ ধরুম্ ধুম্ বুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও?"

ইর্ফাবন কাতর স্বরে বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ

করিয়াছে।”

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। “দুড়ুম্, দুড়ুম্ দুম্” আবার কামান গর্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীমনাদ লম্ফে লম্ফে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারিদিক হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল—অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্চনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জিয়া উঠিল—ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্সম, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, “চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারিদিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে। চারিদিক ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব?”

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “চিন্তা নাই,—দেখিতেছ না, কোন্ দিকে যবনসেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়ণপরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্তী হই। তোমরা আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।”

তিনজনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদগামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন, সম্মুখে একদল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দূঢ় পর্বতরন্ধ্র-পথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে বিমনা হইয়া বলিলেন, “প্রতাপ! এ দুর্জয় রণে তুমি কেন? ফের।”

“আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া

আসি।”

এই বলিয়া প্রতাপ, তিনজনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। তিনি পর্বতমালামধ্যস্থ নির্গমন পথসকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমর-ক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট, দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, “প্রতাপ, তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।”

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কাণে কাণে শুনিবে; আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্যসত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ। এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অনুমতিসাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও! আশীর্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাতপূর্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা যাও?”

প্রতাপ বলিলেন, “যুদ্ধে।”

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।”

প্রতাপ বলিলেন, “ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।”

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন। বলিলেন, “ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।”

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, “আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।”

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, “প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?”

প্রতাপ, মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আমার প্রয়োজন

আছে।” এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া, রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, “তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।”

চন্দ্রশেখর বলিলেন, “আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।” রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।”

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপাকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ “জল! জল!” করিয়া আর্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে, আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধৃবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে, রক্তপ্লাবিত হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা সকলেই পলাইতেছে—তবে যুদ্ধ করিল কে?”

সিপাহী বলিল, “কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।”

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?" সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই, কয়েকজন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্রে স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া প্রতাপের মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্য, হস্তোত্তোলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনই আশীর্বাদ করিতেছি, আরোগ্যলাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই। আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিল, "আপনি, কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলে, তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোকারী, তাহাদিগের সুখের কন্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চক্ষে জল আসিল; আর কেহ কখন রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ডমাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্ত সিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখন মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তের কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, “তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।”

রমানন্দ স্বামী নীরব হইয়া হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ—শয্যায়, অনিন্দ্যজ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।